খোসলা কা ঘোসলা - দ্বিতীয় পর্ব

মৈত্রেয়ী কুমার

Online version: http://wp.me/p7iuFD-4a

(প্রথম পর্বের গল্প পড়ুন এখানে: http://wp.me/p7iuFD-41)

২৭শে মার্চ (চলছে)

‘মা, ওই তো রাসমুসের গাড়ি !’ চীৎকার করে উঠল মেয়ে। দেখি স্টীয়ারিং-এ বসে আমাদের দেখে হাত নাড়ছে আর অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে ফোনে। ফোন লাগাতার বিজি যাওয়ার কারণ বোঝা গেল।

রাসমুস চাবির রিং আঙুলে ঘুরিয়ে সিটি মারতে মারতে গাড়ি থেকে নেমে এল ঠিক যেন অক্ষয়কুমার। গম্ভীর গলায় কর্তা শুধোল, ‘কি হয়েছিল কি, এতো দেরী যে!’ কান পর্য্যন্ত হাসি টেনে রাসমুস বললে,‘রাস্তাটা একটু গুলিয়ে গেছিল। আর রাস্তায় যে ট্রাফিক! কখনো কখনো কোপেনহেগেনে ট্রাফিক জ্যাম...’ বলেই ‘টু...টু...উ’ করে একটা সিটি দিয়ে আঙুলে মুদ্রা করে বোঝালো, ‘অসহ্য!’ হুঃ, আমরা দিল্লী-কোলকাতার লোক, আমাদের ট্রাফিক জ্যাম দেখাচ্ছে!

এরা কোন বুদ্ধিতে এই বাড়ির ঝাঁক বানিয়েছে! ঢুকেই নাক বরাবার টয়লেট! তারপর যথারীতি গড়ের মাঠ ড্রইং-ডাইনিং, আর গুহাকন্দর সদৃশ বেডরুম। দর্শনের সাথে সাথে কান জুড়োচ্ছে রাসমুসের বাড়ির গুণকীর্তন পাঁচালি পড়ায়:

‘শুনো শুনো কোপেনহেগেনের নবাগত জন।
এ দেশের বাড়িঘর করি গো বর্ণন।।
হেথা হের হস্তীরূপা ড্রইং-ডাইনিং।
ও ধারেতে চুহা-ঘরে পাতিবে বেডিং।।
হেথা এবে ওপেন কিচেন শোভে কি বাহার।
হৃষ্ট চিত্তে করো সবে মৎস মাংস আহার।।’

তবু আমাদের ব্যাজারপনা মুখ দেখে শেষে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ে রাসমুস। ‘এখানে বাড়ি নিলে একমাসের ভাড়া বিলকুল ফ্রি - ফ্রি - ফ্রি!’ কল্পতরু মুদ্রায় দাঁড়ায় রাসমুস।‘জায়গাটা নতুন। সবে বসতি হচ্ছে, এ সুযোগ আর পাবে না। এখন বলো, কি বলছ?’

‘এই ধ্যাধ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে একমাস কেন, বারোমাসের ভাড়া মাফ করলেও লোক ভরবে কি না সন্দেহ।’ সাফ কথা রাসমুসকে জানিয়ে দিলাম।

৩রা এপ্রিল

দীর্ঘ আঠাশ বছর পরে পাকিস্তানকে হারিয়ে ক্রিকেট বিশ্ব কাপ জিতে নিয়েছে ইণ্ডিয়া। এই প্রথম এ দেশে আসার পর একটা শনিবার অন্ততঃ বাড়ি দেখার হাত থেকে বেঁচেছি। গোটা দুপুর ইণ্টারনেটে জমাটি খেলা দেখলাম। ইণ্ডিয়ার খেলা দেখে এখানকার বসন্তের ফুল ড্যাফোডিলের সব বাসন্তী রংটুকু ছড়িয়ে গেল মনে।

৪ঠা এপ্রিল

আজ বেশ কিছু বাড়ি দেখার যোজনা। নির্দৃষ্ট সময়ে নতুন ডীলার স্টীন্-এর সঙ্গে দেখা করলাম। কথা না বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করে 'হাই' পর্ব চুকিয়ে ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভিতরে। পুরনো ধাঁচের বাড়ি। লাল ইঁটের গাঁথুনি, লাল টালি, তাতে চওড়া ফুঁকোওয়ালা চিমনী আর সাদা কাঠের ফ্রেমে বন্ধ দরজা জালনায় ঠাসবুনটে ভাব — এই হল ডেনমার্কের পুরনো ধাঁচের বাড়ির মোটামুটি আদল।

(পুরনো ধাঁচের বাড়ি ঘরে ভরা কোপেনহেগেন। ছবি: কান্তি কুমার)

সিঁড়ি ভেঙে হাঁফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠলাম। যে ফ্ল্যাটটা দেখব, সেই ফ্ল্যাটের দরজায় স্টীন্ বারদুয়েক বেল দিলো। ডীলারদের কাছে ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি থাকে, তবু হয় তো বাড়ির মালিক বা তখনো বসবাসকারী ভাড়াটে বাড়িতে থাকতে পারে, তাই ঢোকার আগে বেল বাজিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নেওয়া আর কি! বেশ কয়েকবার বেল বাজানোর পর ভেতরে ঢোকা হল। রামঃ! এ ঘর না আস্তাবল? কি ছত্রাখান অবস্থা! টেবিলে অর্দ্ধেক খাওয়া দই-এর ভাণ্ড। এঁটো কফি কাপ। হুলুস্থুলু অবস্থায় পড়ে থাকা জামাকাপড়, ব্যাগ বই খাতা ফাইল পত্তরে মেঝে স্তূপাকার। সোফাতে ক্যাতরানো দামী ক্যামেরা। দরজার পাশে উল্টে পড়ে থাকা দুম্বোমুখো বুট। ক্যামেরার ট্রাইপড দরজার পেছনে যেন ত্রিভঙ্গ মুরারী। কি নেই এই বিচিত্র শো রুমে!

এরই মাঝে স্টীন্ আখর দিয়ে আমাদের পরিচিত সুরে শুরু করে দিয়েছে বাড়ির গুণকীর্তন পালা। সুর ধরে ধরে আমরা ড্রইং-ডাইনিং পেরিয়ে কিচেনে পৌঁছলাম। এখানকার অবস্থাও তথৈবচ। টেবিলের উপর পেট কাটা তরমুজ। তার অর্দ্ধেক শাঁস কুরিয়ে খাওয়া হয়েছে। সিঙ্কে গাদাগুচ্ছের এঁটো বাসন। টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছি, হঠাৎ ভীষণ দুম্ দুম্ দুম্ শব্দে কাঠের মেঝে সহ গোটা ফ্ল্যাট থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। ভূমিকম্প না কি! পলকে এক দশাসই মহিলা চোখে চওড়া কালো ফ্রেমের চশমা এবং কোমরে ল্যাঙট বাঁধা অবস্থায় রান্নাঘরের দরজার ফ্রেমে দু হাত কোমরে দিয়ে দাঁড়ালো। আধ মিনিট কোন পক্ষেই কথা নেই। হতবাক সবাই। তারপর প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে মাথার চূড়ো বাঁধা চুল ঝাঁকিয়ে, হাত পা দুলিয়ে ডেনিশ ভাষায় তুবড়ি ছোটাতে লাগল ভীষণদর্শনা। স্টীনের সিঁটকানো মূর্তি দেখে বুঝতে পারলাম এখন তার শিরে সংক্রান্তি। এবং বোধহয় আমাদেরও। তেজী ঘোড়ার মতন মহিলা নিজের গদামার্কা পা দুটো দাপাতে দাপাতে ড্রইং রুমের দিকে চলে গেল। পেছন পেছন গেল স্টীন্। আর আমরা সভয়ে কাটা তরমুজের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খানিক ক্ষণের প্রচণ্ড বাকযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত চেহারায় রান্নাঘরে ফেরত এল স্টীন্। এসেই কল খুলে এক গ্লাস জল গঁক গঁক করে গিলে এই পরিস্থিতির জন্য ক্ষমা চাইল আমাদের কাছে। 'দ্যাখো তো কি বিপদ!' করুণ সুরে বললে স্টীন, 'আমি এতবার বেল দিলাম, ও শুনতে পেল না? এখন বলে আমরা না কি ট্রেসপাস্ করে ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। ও কেস্ করতে পারে আমার নামে।' মুষড়ে যায় স্টীন। কুম্ভকর্ণী বলে কি! আমরা ভয় পাইয়েছি ওকে?'

স্টীনকে নির্ভয় বাণী শুনিয়ে মাতব্বরী ফলাতে যাবো, দু-উ-উ-ম করে ওপাশের দরজা বন্ধ হল। অকালে ঘুম ভাঙার গোঁসা নিয়ে কুম্ভকর্ণী ফের ঘরে খিল দিলেন। বাড়ি দেখা মাথায় উঠল। শেষে কি মিশন মকান 'প্রহারেণ সমাপয়েত্' হবে! মানে মানে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তায় নেমে অলস ভঙ্গীতে হাঁটছি আমরা। কারো মুখে কথাটি নেই। আমাদের মিয়োনো চেহারা দেখে স্টীন্ বললে, 'ছাড়ো তো ওই বাড়ি! চল, তোমাদের এমন একখানা বড়ি দেখাবো না, কেয়া বাত বলে নৃত্য করবে।' বাড়ির বর্ণনা শুনতে শুনতে কান জুড়িয়ে গেল। একটু আগে ভীমা ফোটোগ্রাফারনির হাতে প্রায় মার খেতে খেতে বেঁচে ফিরে আসার অপমানও ভুলে গেলাম। স্টীনের গাড়িটাকে কল্পনার ঘোড়া করে সীট বেল্টের জিন টেনে গ্যাঁট হয়ে বসলাম। হু হু ছুটে চলেছে মন।

স্টীন্ বলে চলল, 'পাঁচ ভূতের ফ্ল্যাট বাড়ি নয়, ধনী পাড়ায় ভিলা বাড়ি। সামনে পেছনে বাগান, চারখানা বেডরুম, গেস্টরুম, কিচেনের পেছনবাগে বাগিচা, বাড়ির সামনে তো বটেই। খুব আলো-হাওয়া। বাগানে খুব ফলের গাছ। আপেল, চেরী, এপ্রিকট, আঙুর, সব রকমের বেরী।' আহা, স্টীনের কথার মৌচাক ফেটে কানে যেন মধু গড়াচ্ছে। ওই তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কাপড় শুকোতে গামলা কোমরে আমি বাগানে। ইচ্ছে মতন চেরী তুলছি, পটাপট মুখে পুরছি। আধুনিক মড্যুলার কিচেনে স্প্যাটুলা হাতে মহানন্দে নেচে নেচে থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় রাঁধছি।

'ঘ্যাঁ অ্যাচ্' শব্দে কল্পনার ঘোড়া হোঁচট খেয়ে দাঁড়ালো। এসে গেছি স্বপ্নের ভিলা বাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে সাবধানে চোখ তুলে দেখলাম। পাছে আমার স্বপ্নের ভিলা বাস্তবের গুঁতুনিতে চুরচুর না হয়ে যায়। নাঃ, স্টীন একফোঁটা বাড়িয়ে বলেনি। ভিলা বটে একখানা। কিন্তু কর্তার মুখখানা এতো ব্যাজারপনা কেন? কাছে গিয়ে ভুরু নাচিয়ে হেসে বললাম, 'কেমন বুঝছো?' সে গোমড়া মুখে বললে,'বাড়িটার যা দশাসই চেহারা, এর ভেতর-বাইর পরিষ্কার রাখতে দম বেরিয়ে যাবে।' শুনে গুম মেরে গেলাম।

কর্তার ব্যাজারপনা চলতেই থাকলো। 'উঠোনের প্যাসেজখানার বাহার দেখলে? কবলস্টোন দিয়ে পথ বানানো হয়েছে! সারা শীতকাল বরফ জমে থাকবে। নিত্যি এই এতটা রাস্তার বরফ কাটো। পোস্টম্যান, ডেলিভারীম্যান বা নিদেন ধরো তোমার কোন গেস্ট যদি আছাড় খেয়ে কোমরটি ভাঙে তাহলে নেগলিজেন্সীর দায়ে ফাইন তো ভরতে হবে, প্লাস্ নিজেদের গাঁঠ কেটে তার পুরো চিকিচ্ছের ভার নিতে হবে।'

নাঃ, রাগ আর সামলাতে পারছি না। ফুটন্ত গলায় বলি,'আর কিছু?'

'আর বলতে, এই এত বড় বাগান, তাও আবার দুদিকে। একে সামলানো তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। পুরো গরমকালটা বাগানের ঘাস ছাঁটতে ছাঁটতে আমার তো দম বেরিয়ে যাবে! এসব দেশের পলিসি জানো তো, আগাছা নোংরা বাগান আর বরফে ঢাকা প্রাইভেট যাতায়াতের পথ ক্লিন শেভড্ না রাখলেই মোটা ফাইন!' তারপর কাতর গলায় সে বললে, 'মানে, বলছিলাম কি, ওই দানবের মত ঘাস ছাঁটা আর বরফ কাটার মেশিন দুটো দেখলে? বছর ভর ও দুটোর ভার বওয়া কি এ বাঙালী হাড়ে সইবে?'

'নিকুচি করেছে বাড়ি দেখার,' চেঁচিয়ে উঠি আমি। 'এত কষ্টের পর যাও বা একটা বাগানওয়ালা বাড়ি পাওয়া গেল, হাজার ফ্যাকড়া বার করছ তুমি?'

বাক্যবাণে লাগাম টানতে হল। ভুঁইফোড়ের মত স্টীন্ এসে হাজির। একগাল হেসে বললো, 'হাত পা ছড়িয়ে আরামসে থাকতে পারবে। এই পাড়াটার হিসেবে ভাড়া তেমন কিছু নয়। বলেছিলাম না, এক্কেবারে খাসা জিনিস হ্যাণ্ডওভার করবো!'

আমাতে-কর্তাতে চোখাচোখি হল। তখন চৈত্র মাস নয় তবু আমার চোখে কর্তামশাই কিছু সর্বনাশ দেখে থাকবে। নিমপাচন গেলার গলায় সে বলে উঠল, 'ওক্কে, ডীল!'

এখন বাড়ির লোকেশানটা বুঝতে হবে। স্টীন্ রান্নাঘরের টেবিলের উপর একটা ম্যাপ মেলে ধরলো। ঝুঁকে পড়ে দেখি একটা কচিপানা রাস্তা। 'এই রাস্তার দুই মোড়ে দুটো নেটো পাবে,' বলে ম্যাপে ঢ্যাঁড়া মারে স্টীন্। নেটো হল এখানকার সস্তার সুপার মার্কেট। কিন্তু শুধু নেটো দিয়ে তো আর সংসার চলে না। স্থানীয় দোকান বাজার, ওষুধের দোকান, পোষ্ট অফিস, বাস স্টপ — নিত্যদিনের এই সাঙ্গ পাঙ্গদের চাক্ষুষ বুঝে না নিলে চলে? বাড়িভাড়ার কন্ট্রাক্টের সইসাবুদ পরদিন করা যাবে, এই বলে স্টীন্কে বিদায় দিয়ে আমরা পাড়াদর্শনে বেরলাম।

পথের ধার ধরে সারি দিয়ে ফুলবাগান চর্চিত ভিলা বাড়ি। আজ সূর্যস্নাত দিন। বাগানে বাগানে চলছে গরমের প্রস্তুতি। ঘাস ছাঁটার মেশিন চলছে। আগাছা বাড়তি ডালগুলো ইয়াব্বড় কাঁচি দিয়ে কেটে দিচ্ছে কেউ। কেউ বা বাগানে ফুলগাছের কেয়ারি তৈরী করে রাখছে। একজন দেখি বাগানে ছোটখাটো একটা কৃত্রিম পুল বানিয়ে রেখেছে। পরে জল ভরে গোটা গরমে দিব্যি চুবে থাকবে!

প্রকৃতিতেও সামার কালেকশানের প্রস্তুতি। ম্যাগনোলিয়া গাছে কুঁড়ি ধরেছে। স্থলপদ্মের মতন গোলাপি-সাদা থোকা থোকা ফুলে ভরে যাবে গাছ। চেরী গাছে ফুলের সময় এল বলে। সাদা আর হালকা গোলাপি ফুলে ভরে যাবে এই গাছও। রাস্তা ঘাট পথ প্রান্তরের একটা কোনও ফুলহীন সজ্জাহীন থাকবে না। আকাশ হবে আরো নিঃসীম নীল আর প্রকৃতিতে চোখ জুড়নো কি শ্যামলিমা।

'পথের শেষ কোথায়, কি আছে শেষে!' ম্যাপে যে রাস্তাকে দেখে কচিপানা বোধ হয়েছিল, এখন দেখি সে অজগরের মতন বিছিয়ে রয়েছে। হতবুদ্ধির মতন এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। দেখি এক সাইকেল আরোহীণি আসছে। হাত দেখিয়ে থামালাম তাকে। শুধোলাম স্থানীয় বাজার দোকানের হদিস। সে বললে, 'বাজার দোকান তো দু' কিলোমিটারের মধ্যে পাবে না।'

'আর নেটো?' ব্যগ্র হয়ে শুধোই। তাতে সে যা ডিরেকশান দিল, তা পুরোপুরি 'আমড়া তলার মোড়' থেকে 'আদ্যানাথের মেসো'-র বাড়ি খুঁজে বের করার মতন অসম্ভব। পত্রপাঠ স্টেশনমুখো হাঁটা লাগালাম।

<u>৫ই এপ্রিল</u>

আপাততঃ যে ফ্ল্যাটখানিতে আছি সেটা অ্যাটিকের। স্টীন্ই জোগাড় করে দিয়েছে। হোটেলে আর পোষাচ্ছিল না। বাইরের খাওয়া, হোটেল ভাড়ার খরচ! যদ্দিন না মনের মতন কিছু জোটে এখানেই থাকবো। ভাড়ার বিছানায় শোওয়া, ভাড়ার বাসনপত্রে রাঁধা। বেশ একটা পিকনিক পিকনিক ভাব। সকালে কর্তা অফিসে বেরিয়ে গেলে কিই বা কাজ থাকে। সপ্তাহ খানেক পরে মেয়ের স্কুল শুরু হবে। বাড়ি দেখার পর্ব যে দিন বা যে বেলা থাকে না, এ জালনা ও জালনা করি। পথচলতি মানুষের বহু বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, ব্যস্ততা, চলনবলন দেখি। বেশ সময় কেটে যায়।

এই বাড়িটার পাশেই একটা ডে কেয়ার স্কুল। বেলা বাড়লেই কচিগলার কলতানে ভরে ওঠে পাড়া। তিন চারটে বাড়ির মাঝে মাঝে একটা করে কমন গার্ডেন। সবুজ ঘাসে ছাওয়া ছোট ছোট গাছের হেজ বাঁধা বাগানগুলো বেশ! বেঁটে বেঁটে আপেল গাছগুলো সবুজ-লাল আপেলে ভরা। কতক বা হেলায় গড়াচ্ছে নীচে। বেলা বাড়লে সূর্যস্নান করতে একটি দুটি করে ডেনিশ মহিলা বেদিং স্যুট পরে বাগানে হাজির হয়। হাতে বই, চোখে সানগ্লাস পরে ঘাসের উপর একটা পাতলা কাপড় বিছিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। সারাদিন ধরে চলে ওদের সূর্যস্নান। দুপুরে বাগানেই শুয়ে বসে স্যাণ্ডউইচ বা ফলপাকুড় যা হোক কিছু খেয়ে নেয়। খাওয়া সেরে আবার গড়ায়। সোনা রোদ মেখে ঘন দুপুর মৌতাতে নিঝুম হয়ে থাকে। এদের দেখে ভাবি, আমরা বাঙালী বাড়ির গেরস্থ বুদ্ধিতে সারাক্ষণ শুধু এটা কর রে, এই ধর রে, এটা হল না, ওটা করতে হবে গোছের গেল গেল ভাব করে সারা জীবন দৌড়ে মরি। রিল্যাক্স করব দৈনন্দিন জীবনকড়চায়! ভাবতে

পারি না। আমাদের রিল্যাক্সেশান তোলা থাকে কেবল হলি ডে-এর জন্য। অবিশ্যি তাতেও যদি ট্যুরিস্ট স্পট পাঠ্যসূচী শেষ করার পরীক্ষা থাকে, তাহলে তো আর কথাই নেই।

জালনায় দাঁড়িয়ে বিচিত্র মানুষ দেখি, আর ভাবি — কত শত দেশ বুকে ধারণ করে আছে এই পৃথিবী। কত বিচিত্র আচার-ব্যবহার, রীতি রেওয়াজ। তবু এত বিচিত্রতার মধ্যে কোথায় যেন একতার সুর বাজে। বিদেশের জোনাথান, আর দেশের জয়ন্ত, ডেনমার্কের পিটারসেন আর কোলকাতার পটলবাবুর মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনায় সব মানুষের মনের তার তো একই সুরে বাজে।

গম্ভীর ভোঁ-ও-ও শব্দে চমক ভাঙে। বল্টিকের বুকে ভেসে থাকা কোন জাহাজ ছাড়ার ঘণ্টি। প্রায়ই শুনি। ছুটে যাই পুবের জালনায়। সোজা তাকালে অনেক বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে ভেসে ওঠে তিনথাকের কালো কালো বিশাল মাস্তুল। বুঝি কোনো মালবাহী জাহাজ অনন্ত সাগর জলে ভাসলো।

কর্তা অফিস ফেরত একগাল হাসি নিয়ে ফেরে। 'হু, হু, বাবা, কি পেয়েছি বল তো?' কৌতুক সুরে প্রশ্ন করে।

গোমড়া মুখে বলি, 'কি, বাড়ি?'

কর্তা বলে, 'তোমার বাড়ির চেয়ে ঢের ভালো জিনিস। গরমাগরম পেঁয়াজি! এক বঙ্গসন্তানের দোকানের খোঁজ পেলাম। যাও যাও, ভাত বাড়ো, খুব খিদে পেয়েছে।' বাঙালী!! এই নর্থপোলের কাছে এসেও পেঁয়াজির দোকান দিয়েছে। আর আমরা মহানন্দে তার সদব্যবহার করছি। বাঙালী স্বর্গে গেলেও ডাল ভাত পেঁয়াজি পেলে ঈশ্বরের কাছে মুক্তি-টুক্তি না চেয়ে গোটা কয়েক পাতিলেবু আর নুন চেয়ে নেবে।

<u>৭ই এপ্রিল</u>

আজ দুপুরে কর্তার তৎকাল ফোনকল পেয়ে বারো মিনিটে তৈরী হয়ে লাগোয়া স্টেশনে চলে এলাম। আজকাল এরকম 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বে' গোত্রের ডাকে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি।

কর্তা বললে, 'এই ডীলারের আমাদের অফিসে বেশ হাতযশ আছে। এখন দেখো!'

ডীলার মহিলার নাম ভিবেকে। বেশ আন্তরিক। করমর্দন করে বললেন,'তোমাদের হতাশা আমি বুঝতে পারছি। এত দিনেও থিতু হতে পারলে না। বোধহয় বেস্ট কিছু অপেক্ষা করছে জানো!' উদাস গলায় বলি, 'তা হবে।' ডীলার বললেন, 'ভেবো না, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।'

তিনটে বাড়ি দেখার কথা। প্রথম পাড়া পোর্ট এরিয়া — ন্যুহাভন্। কোপেনহেগেনের ইতিহাসের সাথে যাঁর নাম আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে সেই রূপকথার জাদুকর হান্স খৃস্টিয়ান অ্যাণ্ডারসেন-এর (১৮০৫ -১৮৭৫) বাড়ি ছিল এ পাড়ায়। হান্স খৃস্টিয়ানের লেখা 'দ্য লিটিল মারমেড', 'দ্য আগলি ডাক্লিং', 'এম্পারার্স নিউ ক্লোদ্স্' এইসব গল্পগুলো পড়ে আমরা বড় হয়েছি। আবার আমাদের সন্তানেরাও এইসব শিশুমনের এক একটি জালনা খুলে দেওয়ার মতন গল্প পড়ে বড় হয়েছে। এই ট্র্যাডিশান চলবেই। শিশু সাহিত্যে অ্যাণ্ডারসেন এক আলোকসমান প্রতিভা।

ক্যানালের গা ঘেঁষে গায়ে গা লাগানো হলুদ-কমলা-নীল-গেরুয়া রঙের লাল টালি ছাদ বাড়িগুলো প্রায় তিনশো বছরের পুরনো। ডেনমার্কের পৃথিবী বিখ্যাত লোগো লিটিল মারমেড-এর স্ট্যাচুর কথা এর আগে শুনেছি। আজ চাক্ষুষ দেখলাম। কি অনন্য সারল্যময় রূপ সৌন্দর্য্য আর আভিজাত্য নিয়ে সে বসে আছে এ পাড়ার বন্দর-মুখে, পাথরের উপর, সাগর জলে।

(১৭০০ সালের ন্যুহাভেন ছিল নাবিকদের ফুর্তি লোটার বন্দর পাড়া। আজ জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট্। ছবি: কান্তি কুমার)

তিনটি বাড়ির মধ্যে দ্বিতীয়টিই সবচেয়ে পছন্দ হল আমাদের। চারতলার উপর, আধুনিক বিলডিং। পূব-পশ্চিম খোলা, দুই বেডরুম-এর ঘর। পুবে সমুদ্রের কোল থেকে সূর্যের ওঠা, আর পশ্চিমের আকাশে আবীর ফাগ খেলতে খেলতে পাটে বসা — নিত্য এই নয়নাভিরাম রূপ দেখতে পাব। নাই বা থাকল ফলের বাগান, চেরী ফুল আর চার-ছটা বেডরুম। অফিস-স্কুল কাছে। বাজার, পোস্ট অফিস, ফার্মেসী, জিম, বাস স্টপ, ট্রেন স্টেশন সবই আয়ত্তের মধ্যে। পুব পশ্চিমের টানা খোলা বারান্দায় দাঁড়ালে আকাশের নীলিমা আর দিগন্তপারের শ্যামলিমা মিলে মিশে একাকার। সাগরপাড়ের উতল হাওয়া।

<u>১৫ই এপ্রিল</u>

চন্দ্র সূর্যের ওঠা নামাকে সাক্ষী রেখে শুভ দিন যাপনের অঙ্গীকার নিয়ে প্রবেশ করলাম আমাদের বাসা বাড়িতে। মন স্নিগ্ধ গোলাপ হয়ে ফুটে আছে। নতুন বাসা বাড়ির চাবি হাতে পেলাম। এবার পিকনিকের পালা শেষ। সংসারের খেলা শুরু। নতুন জায়গার নতুন মাটিতে। নতুন প্রাণের আশায়। নতুন উদ্দীপনায়। সুখে দুঃখে বং জীবনের শেষ আশা ভরসা রবি ঠাকুরের একটা মোক্ষম বাণী বেশ ভাবে ডুবুডুবু হয়ে বলতে যাবো, কর্তা চাবি দিয়ে দরজা খুলে হেঁড়ে গলায় বিকট সুরে বলে উঠলে, ‘ডি লা গ্রাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস!’ তার সাথে মিহি গলায় সঙ্গত এল মেয়ের ‘ইয়াক! ইয়াক!’

দম ফাটা স্বস্তির হাসির হুল্লোড়ে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ঘরে ঢুকে এলাম।